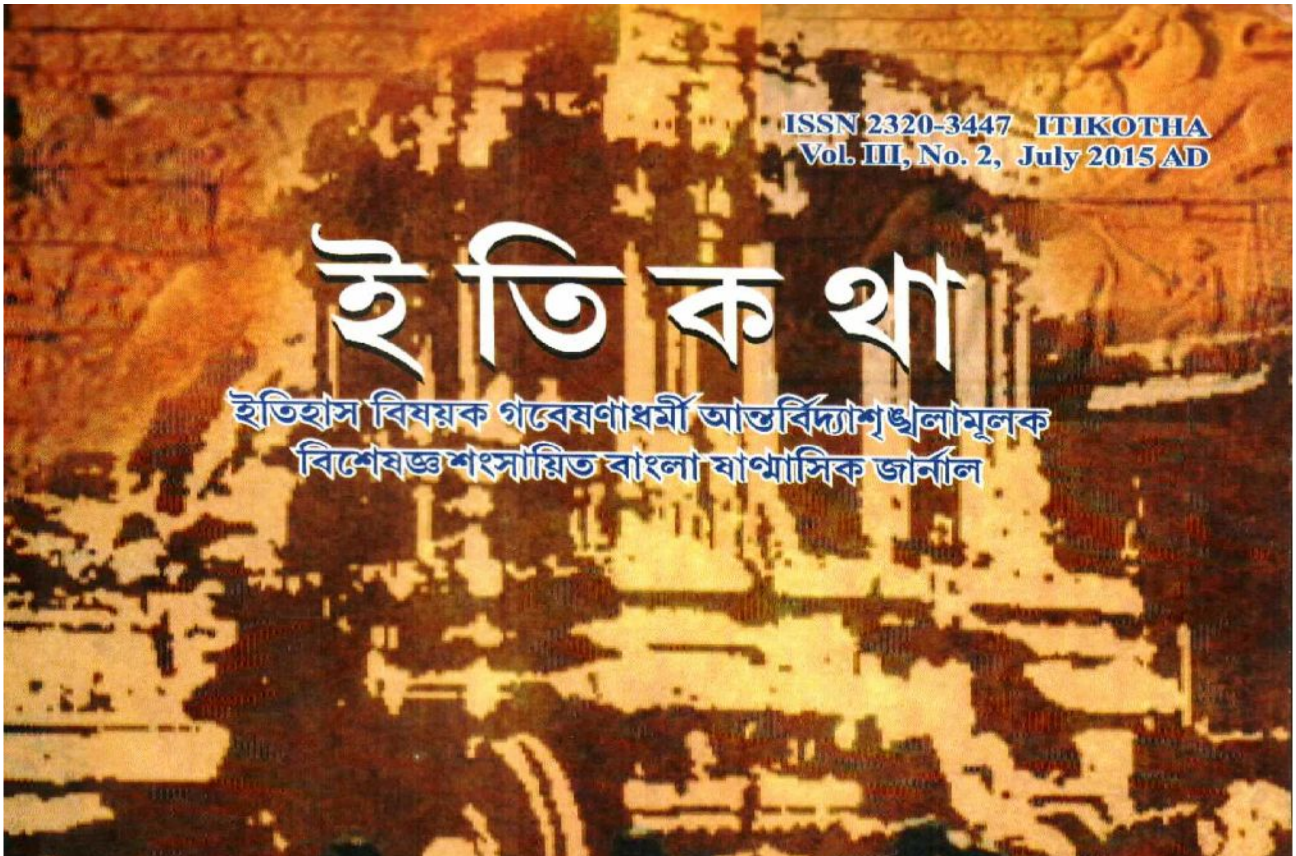
ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. III, No. 2, July 2015 AD
ইতিকথা
ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞশংসায়িত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল
তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

ISSN 2320-3447 ITIKOTHA
Vol. III, No. 2, July 2015 AD

ই তি ক থা

ইতিহাস বিষয়ক গবেষণাধর্মী আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক
বিশেষজ্ঞ সংসারিত বাংলা ষাণ্মাসিক জার্নাল

তৃতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, জুলাই ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

সম্পাদকমণ্ডলী
ড. সৌমিত্র শ্রীমানী (মুখ্য সম্পাদক)
প্রফেসর নির্বাণ বসু
প্রফেসর সনৎকুমার নস্কর
ড. সুচন্দ্রা ঘোষ
প্রফেসর অমিত দে

বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা

ইতিকথা
[illegible] আন্তর্বিদ্যাশৃঙ্খলামূলক বিশেষজ্ঞ শংসায়িত বাংলা ষান্মাসিক জার্নাল
[illegible] Itikatha (Print)
[illegible] No. 2 July 2015 AD

সম্পাদকীয় ৯

[illegible]

ঐতিহাসিক অমলেন্দু গুহ (১৯২৪-২০১৫) ১২
[illegible]

[illegible]

কালী : এক বিবর্তনমূলক ধর্মীয় ঐতিহ্যের সমীক্ষা ১৬
[illegible] চট্টোপাধ্যায়

বাণিজ্য থেকে সাম্রাজ্য-ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ৩৩
[illegible] চক্রবর্তী

ফরাসি কোম্পানি এবং বাংলার বণিক সম্প্রদায়
(১৬৮০-১৭৩০) ৪৫
ইন্দ্রাণী রায়

অষ্টাদশ এবং উনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী
সময়ে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে
বাঙালি বেনিয়ানদের কার্যকলাপের একটি চিত্র ৬১
অমৃতা শেঠ

উনিশ শতকে (১৮৩৫-১৮৯২) প্রাচ্য শিক্ষার অবক্ষয় ৮৮
অমিতকুমার মুখোপাধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিশীলতা ও মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি :
যুক্তি-তর্কের আলোয় ফিরে দেখা ১০৩
দেবাশীষ পাল

দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে নারী শিক্ষার পটপরিবর্তন ও
ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ১৪১
(১৮৭০-১৯০২)
রাহুল দেব

নদিয়া জেলায় উদ্বাস্তু-জীবন
সুভাষ বিশ্বাস ১৭৬

গ্রন্থ-সমালোচনা

বাংলা ভাষায় কাশ্মীর নিয়ে একটি ভালো কাজ,
তবে আরো বহুমাত্রিক হতে পারত
সুপ্রতিম দাশ ২০২

সৌম্যেন্দ্রনাথ ও কলিকাতা
গৌতম ভদ্র ২১৩

ইতিকথা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ২, জুলাই ২০১৫ খ্রি. [ISSN 2320-3447 *Itikotha*] পৃ.১২-১৫
www.bangiyaitihassamiti.wordpress.com

স্মরণালেখ্য

ঐতিহাসিক অমলেন্দু গুহ (১৯২৪-২০১৫)

সিদ্ধার্থ গুহরায়*

(প্রাপ্ত ৩০ জুন ২০১৫ খ্রি.)

গত ৭ ই মে বিদায় নিলেন ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানী অমলেন্দু গুহ। উত্তরপূর্ব ভারত, বিশেষত অসমের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক অসমান্য মাত্রা যোগ করেছিলেন তিনি। তাঁকে বাদ দিয়ে অসমের ইতিহাস চর্চা প্রায় অসম্ভব। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত তাঁর স্বচ্ছন্দ বিচরণ। তবে তাঁকে কেবলমাত্র অসমের ঐতিহাসিক-হিসাবে চিহ্নিত করা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। ঐতিহাসিক গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর সাবলীল আত্মপ্রকাশ। পার্সি শেঠদের ঐতিহাসিক ভূমিকা, ভারতের জাতীয় সংহতি সংক্রান্ত সমস্যা, আফগানিস্তানের অর্থনৈতিক ইতিহাস, মুঘল অর্থনীতি, ব্রিটেনের অর্থনীতিক ইতিহাস ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন।

অমলেন্দুবাবুর ইতিহাস গবেষণা নিয়ে আলোচনা করতে হলে প্রথমেই যে বইটির কথা আসে তা হল— *Planter Raj to Swaraj: Freedom Struggle and Electoral Politics in Assam 1826-1947*। ভারতের একটি প্রদেশের ওপর এ ধরনের প্রমাণ্য গ্রন্থ বিরল। অসমের রাজনৈতিক বিকাশের প্রেক্ষিতে প্রাদেশিক আইনসভার বিবর্তনের ইতিহাস তিনি অসামান্য দক্ষতায় আলোচনা করেছেন, আবার একই সঙ্গে উপনিবেশিক আর্থ-সামাজিক কাঠামোর প্রেক্ষাপট সাবলীল ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। অসমের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রাজনৈতিক কার্যাবলি আইন সভার ভিতরে ও বাইরে কিভাবে আবর্তিত হয়েছিল— তার এক নিপুণ বিশ্লেষণ গ্রন্থটিকে সমৃদ্ধ করেছে। অর্থনৈতিক দাবিদাওয়া ও রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার সমন্বয় অসমের জাতীয় আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি কী ভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, তার একটি যুক্তিনিষ্ঠ ব্যাখ্যাও তিনি তুলে ধরেছিলেন। আর এখানেই প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছিল কৃষক ও শ্রমিকের

*এ্যসোসিয়েট প্রফেসর, বিবেকানন্দ কলেজ, বেহালা
e-mail: bisk707@gmail.com

প্রবন্ধ

কালী : এক বিবর্তনমূলক ধর্মীয় ঐতিহ্যের সমীক্ষা

ঋতুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়*

(প্রাপ্ত ২২ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি., সংশোধিত ২৭ মার্চ ২০১৫ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

কালী আধুনিক হিন্দু ধর্মের সম্ভবত সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবী। কিন্তু তাঁর এই দৈবী সত্ত্বায় যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন ধারার ধর্ম বিশ্বাস ও দার্শনিক ধারণা। এক অনার্য দেবী হিসাবে তাঁর উত্থান হলেও কালক্রমে তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্থান পান এবং এক উচ্চ দার্শনিক চিন্তা ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্থান পেলেও তাঁর অনার্য রূপটি অক্ষুণ্ণ থাকে যে কারণে তিনি উগ্র ও ভয়ঙ্কর রূপের অধিকারী। প্রথম দিকের ব্রাহ্মণ্য ধর্মে তিনি কল্পিত হয়েছেন একজন ঋণাত্মক শক্তির দেবী হিসাবে। কিন্তু কালক্রমে তাঁর এই নেতিবাচক, ভয়ঙ্কর চরিত্রের মধ্যে থেকেই উদ্ভূত হয়েছে একটি কল্যাণময়ী মাতৃরূপ।

সূচকশব্দ

কালী, শিব, তন্ত্র, কৌল, কাপালিক, মহাবিদ্যা, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য বা পরবর্তী হিন্দু ধর্মের সূচনা হয়েছিল বৈদিক ধর্মাচরণের মধ্য থেকেই। কিন্তু বৈদিক ধর্মাচরণে পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাব খুবই পরিস্ফুট। প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ বৈদিক দেবতাই পুরুষ, নারী দেবতাদের গুরুত্ব প্রায় নেই বললেই চলে। এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে ঋকবেদে দেবতাদের মধ্যে কোনো স্পষ্ট স্তরায়ণ নেই।[১] তবে ঋকবৈদিক দেবতাদের ক্রমিক অবস্থানের তারতম্য বা

* পিএইচ. ডি. গবেষক, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-১৯।
e-mail: rituparna.ch@rediffmail.com

বাণিজ্য থেকে সাম্রাজ্য-ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী*

(প্রাপ্ত ২২ জুলাই ২০১৫ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

মুঘল রাষ্ট্রশক্তি যথেষ্ট ক্ষমতাবান হলেও সমুদ্রনীতি প্রণয়নে তা ব্যর্থ হয়েছিল, বাণিজ্য-সমৃদ্ধ গুজরাট জয়ের পর আকবর সর্বপ্রথম সমুদ্রদর্শন করেন এবং সমুদ্র বাণিজ্যের মুনাফা তথা গুরুত্ব উপলব্ধি করতে বিলম্ব করেন নি। সেই শুরু। মুঘল রাজ পরিবার, তার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়বর্গ সহ সাম্রাজ্যের অভিজাতকুল সমুদ্র বাণিজ্যে আগ্রহী হয়ে উঠল। কিন্তু নিজ কর্তৃত্বে কিভাবে সেই বাণিজ্যকে চালনা করা যাবে— এ নিয়ে কোনো ভাবনা-চিন্তা ছিল না। ইতিমধ্যে 'সুলতানি রাজত্বকাল থেকে পোর্তুগিজরা ভারত মহাসাগরীয় জলক্ষেত্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল। বাণিজ্যের নামে তারা দস্যুবৃত্তি করত। ভয় ভীতি প্রদর্শন করে তারা আকবরকেও দমিয়ে রাখতে সফল হয়েছিল। তাদেরই চাপে প্রাথমিক পর্বে ইংরেজদের ভারতে প্রবেশে যথেষ্ট অসুবিধা হয়। কিন্তু তারা হাল ছাড়ে নি। দীর্ঘকাল ধরে নানাসূত্রে ভারতের সম্পদের কথা তারা জানত। অবশেষে তারা পর্তুগিজদের পথই নিল। প্রথমে পর্তুগিজদের পরাজিত করে ভারতীয়দের মনে নিজেদের সম্পর্কে এক সম্ভ্রমের মনোভাবের জন্ম দিল। অতি দ্রুত তারা গোলাবারুদের সাহায্যে মুঘল সম্রাটদের নিকট থেকে নানা পর্বে নানারকম অতিরাষ্ট্রিক বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করে নেয়। তাদের লক্ষ্য স্থির ছিল। তারা ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের লক্ষ্যেই শুরু থেকে কাজ করতে থাকে এবং অবশেষে ভারতীয় বণিকদের সাহায্য লাভ করে। অতঃপর ভারতকে পরাভূত করায় আর কেনো সমস্যাই থাকে নি।

সূচকশব্দ

আকবর, পর্তুগিজ, উপকূল, গুজরাট, বাণিজ্য, Qmfort displomacy

---

*সভাপতি, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ওরিয়েন্টাল স্টাডিজ এন্ড রিসার্চ।
e-mail: bisk707@gmail.com

ফরাসি কোম্পানি এবং বাংলার বণিক সম্প্রদায় (১৬৮০-১৭৩০)

ইন্দ্রাণী রায়*

সপ্তদশ শতকের শেষে বাংলার বাণিজ্যিক রঙ্গমঞ্চে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আবির্ভাবের পেছনে একাধিক কারণ ছিল। এরমধ্যে ইউরোপে ভারতীয় পণ্যের (Indiennes) চাহিদা প্রতিফলিত হয়েছিল। রঞ্জিত বস্ত্র এবং অপেক্ষাকৃত ভারী রেশম পণ্যের চাহিদা রূপান্তরিত হয়েছিল ছাপা, নকশাদার (exmbroidered) বা সাদা মলমলের (Mallemole) উৎকৃষ্টতর এবং নানাধরনের বস্ত্রের চাহিদায়। একটি স্মৃতিচারণে কোম্পানির পরিচালকরা উল্লেখ করেছেন যে এই চাহিদার পেছনে ছিল তখনকার প্রচলিত রীতি এবং এই ধরণের বস্ত্রে চোখ এত সয়ে গিয়েছিল যে এই কাপড় ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারা যেত না।[১] পণ্ডিচেরির ধুরন্ধর বণিক-প্রশাসক ফ্রাঁসোয়া মার্টিন ইতিমধ্যেই বাংলার বাণিজ্যের সম্ভাবনা পরিমাপ করে নিয়েছিলেন। ভারতে প্রথম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরাসি বাণিজ্যকেন্দ্র সুরাটে যে ফরাসিদের বাণিজ্যিক কার্যকলাপ ক্রমশ কঠিনতর হয়ে উঠছে তা-ও তিনি সঠিকভাবে অনুধাবন করেছিলেন। ১৬৮২ সালের মার্চ মাসে রচিত তাঁর স্মৃতিচারণায় তিনি দুঃখ না করে পারেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল যে কি এক মোহে আবিষ্ট হয়ে অন্যান্য অঞ্চলের কথা বেশি না গণ্য করে সুরাটেই কোম্পানি নিজেকে আটকে রেখেছে।[২] কিন্তু যখন

---

*যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ইন্দ্রাণী রায়ের প্রয়াণ ঘটেছিল অকালে। ফরাসি দলিল ইত্যাদি নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল নানাভাবে গবেষণা করেছিলেন। তাঁর এই প্রবন্ধটি মূল ইংরেজি ভাষায়, The French Company and the Merchants of Bengal (1680-1730) এই শিরোনামে *Indian Economic and Social History Review* পত্রিকার অষ্টম খন্ডের প্রথম সংখ্যায় (১৯৭১ খ্রি.) প্রকাশিত হয়েছিল। ৪১ থেকে ৫৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই প্রবন্ধের আকরপঞ্জি সংগৃহীত হয়েছিল প্রধানত প্যারিসের ন্যাশানাল আর্কাইভ থেকে।

প্রবন্ধটির বঙ্গানুবাদ করেছেন ড. তপতী ভট্টাচার্য। অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কলেজ, নিউ ব্যারাকপুর। প্রবন্ধটির অনুবাদ ইতিকথা-য় প্রকাশের জন্য *Indian Economic and Soical History Reivew* পত্রিকার প্রকাশকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ— সম্পাদকমণ্ডলী)

অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ে পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাঙালি বেনিয়ানদের কার্যকলাপের একটি চিত্র

অমৃতা শেঠ*

(প্রাপ্ত ২২ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি., সংশোধিত ২৭ মার্চ ২০১৫ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

ইদানিংকালে জাতীয়তাবাদী 'অবশিল্পায়ন, তত্ত্বের বিপক্ষে কিছু সংশোধনবাদী ইতিহাসকার দেশীয় শিল্প ও বণিক সম্প্রদায়ের নিরবিচ্ছিন্ন অস্তিত্বের সমক্ষে সাওয়াল করেছেন। প্রকৃতপক্ষে ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াপত্তনের সময় থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক শোষণের প্রক্রিয়াটির ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটেছে, ঔপনিবেশিক শাসনের গোড়াপত্তনের সময় থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে অর্থনৈতিক শোষণের প্রক্রিয়াটির ধারাবাহিক পরিবর্তন ঘটেছে, ঔপনিবেশিক প্রাণকেন্দ্র (Metropole) ব্রিটেনের অর্থনীতির নিজস্ব গতিময়তার কারণে। বিশেষত ইংল্যান্ডের শিল্পবিপ্লবোত্তর পরিস্থিতি তার সাথে ভারতসহ প্রান্তিক (Periphery) অর্থনীতিগুলোর অর্থনৈতিক আদানপ্রদানের চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। মুক্ত বাণিজ্য নীতির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ভারতে ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকারের উপরে প্রশ্ন তুলতে থাকে। পরিণামে ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ খ্রি. চার্টার অ্যাক্ট ভারতে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটায় যা ভারতীয় অর্থনৈতিক ইতিহাসে জলবিভাজিকা স্বরূপ। একইসাথে ইংল্যান্ড, মহাদেশীয় ইউরোপ এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে থেকে মুক্ত বণিকদের আগমন বাঙালি তথ্য ভারতীয় বণিকদের কার্যকলাপে নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। বাংলার অর্থনীতিতে যার প্রতিক্রিয়া যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

সূচকশব্দ

অব-শিল্পায়ন, অংশীদারি কারবার, ইউরোপীয় কুঠি, ইন্দো-ব্রিটিশ

* এম.ফি গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail: settamrita8@gmail.com

উনিশ শতকে (১৮৩৫-১৮৯২) প্রাচ্য শিক্ষার অবক্ষয়

অমিতকুমার মুখোপাধ্যায়*

(প্রাপ্ত ফেব্রুয়ারী ২০১৫ খ্রি., সংশোধিত মে ২০১৫ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

পলাশির যুদ্ধের পর দ্রুত বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমন কি, সাংস্কৃতিক জীবনে পরিবর্তন ঘটে যায়। ১৭৬৫ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুবা বাংলার দেওয়ানি শাসন লাভ করায় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে ভাষাগত পর্বির্তন ঘটানো হল। মুঘল প্রশাসনিক ভাষা ছিল ফারসি এবং তার চর্চা স্বাভাবিক নিয়মেই ছিল জনপ্রিয়। ফারসির সঙ্গে জড়িত ছিল আরবি ও সংস্কৃত ভাষার চর্চা যদিও দুটি ভাষাই ধর্মচর্চার অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হত। এদের শিক্ষার জন্য অগণিত টোল ও মাদ্রাসা নানাভাবে গড়ে ওঠে। কিন্তু তাদের সেই দিন আর বজায় রাখা গেল না। সরকারি স্তরে ইংরেজীর সঙ্গে স্থানীয় ভাষায় গুরুত্ব আরোপ করার কারণে সংস্কৃত ও আরবি-ফারসির চর্চাও বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। পরিবর্তিত পরিবেশে হিন্দুরা যদিও দ্রুততার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারল মুসলমানরা তা পারল না। বাংলায় আবার অভিজাত মুসলমানদের অর্থাৎ, আশরফদের গরিষ্ঠ অংশই ছিল উর্দুভাষী। তারা কোনোমতেই ইংরেজদের শাসন তথা তাদের আরোপিত যাবতীয় ব্যবস্থাকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। অন্যদিকে দফায় দফায় সরকার বিভিন্ন মাপের কমিটি গঠন করে শিক্ষায় আধুনিকিকরণ করতে চলেছে। এইসব মিলিতভাবে দেশীয় তথা প্রচলিত ভাষাসমূহের দুর্দিন ডেকে আনে।

সূচকশব্দ

টোল, ফারসি, ইংরেজি, মুসলমান

পাশ্চাত্য থেকে শিক্ষাগ্রহণ নির্ভর করে একটি দেশে রাজনৈতিকভাবে কতটা স্বাধীন তার ওপর। জাপানে এবং সীমিত অর্থে অটোমান তুরস্ক ও মহম্মদ আলির মিশরে দেশীয় ভাষার উপর নির্ভর করে আধুনিকীকরণ প্রচেষ্টার সূত্রপাত ঘটেছিল

*অধ্যাপক (অব.), ইতিহাস বিভাগ, প্রেসিডন্সী কলেজ, কলকাতা।
e-mail: bisk707@gmail.com

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিশীলতা ও মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি : যুক্তি-তর্কের আলোয় ফিরে দেখা

দেবাশীষ পাল*

(প্রাপ্ত ২২ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি., সংশোধিত ১ আগস্ট ২০১৫ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

সাহিত্যকে বলা হয় সমাজের দর্পন। সাহিত্য সম্রাট তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে মানুষের জৈব, আধ্যাত্মিক ও নান্দনিক দিকগুলো এবং মানুষের প্রবৃত্তি, বুদ্ধি ও কর্মশক্তিকে নতুনভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর সৃষ্টিশীলতায় তাঁর সৃষ্ট সমস্ত চরিত্রগুলি চিত্রায়িত হয়েছিল। সেই সমস্ত চরিত্রগুলিকে তিনি তাঁর স্বীয় ধর্ম নৈতিকতায় আবর্তে বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে চরিত্রগুলি মনুষ্যত্বের সদ্গুণগুলি রপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে সেগুলি তাঁর কশাঘাত থেকে রেহাই পায়নি। এতদসত্ত্বেও মুসলমান সমাজের কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের মধ্যে এক মুসলিম-বিদ্বেষের বীজকে খুঁজে পান। তারা মনে করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম চরিত্রগুলিকে হিন্দুদের অপেক্ষায় কর্যদভাবে চিত্রিত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বজাতি-রাজপুত এমনকি ফরাসীদেরও গৌরবান্বিতভাবে ফুটিয়ে তুলে, মুসলিম শাসকদের অত্যাচারী, দুর্বল, বিশ্বাসঘাতক হিসাবে দেখিয়েছেন। অন্যদিকে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের ধ্বজা তুলে ধরতে, তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে হিন্দু দেবীকে অন্তর্ভুক্ত করে, দেশকে 'মা' হিসাবে কল্পনা করেছিলেন। 'বন্দেমাতরম্'-এ দুর্গার স্তব গান গাওয়া হয়েছিল। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুরাজ্য পত্তনের মাধ্যমে মুসলমানকে ভারতবর্ষীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার 'অপচেষ্টায়' সামিল হয়েছেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান লেখকদের এই সমস্ত বক্তব্যগুলিকে যেমন সমস্ত মুসলিম শ্রেণি সঠিক বলে মেনে নেননি, তেমনি অন্যান্য আলোচকরাও এই তীব্র বঙ্কিম বিদ্বেষীকে সহ্য করেননি। আর এইভাবেই আমাদের আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটন উঠে আসে।

---

*স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail: debasispal2015@gmail.com

বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিশীলতা ও মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি : যুক্তি-তর্কের আলোয় ফিরে দেখা

দেবাশীষ পাল*

(প্রাপ্ত ২২ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি., সংশোধিত ১ আগস্ট ২০১৫ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

সাহিত্যকে বলা হয় সমাজের দর্পন। সাহিত্য সম্রাট তাঁর সাহিত্যকর্মের মাধ্যমে মানুষের জৈব, আধ্যাত্মিক ও নান্দনিক দিকগুলো এবং মানুষের প্রবৃত্তি, বুদ্ধি ও কর্মশক্তিকে নতুনভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর সৃষ্টিশীলতায় তাঁর সৃষ্ট সমস্ত চরিত্রগুলি চিত্রায়িত হয়েছিল। সেই সমস্ত চরিত্রগুলিকে তিনি তাঁর স্বীয় ধর্ম নৈতিকতায় আবর্তে বাঁধতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে চরিত্রগুলি মনুষ্যত্বের সদ্‌গুণগুলি রপ্ত করতে ব্যর্থ হয়েছে সেগুলি তাঁর কশাঘাত থেকে রেহাই পায়নি। এতদসত্ত্বেও মুসলমান সমাজের কেউ কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকর্মের মধ্যে এক মুসলিম-বিদ্বেষের বীজকে খুঁজে পান। তারা মনে করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র মুসলিম চরিত্রগুলিকে হিন্দুদের অপেক্ষায় কর্যদভাবে চিত্রিত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বজাতি-রাজপুত এমনকি ফরাসীদেরও গৌরবান্বিতভাবে ফুটিয়ে তুলে, মুসলিম শাসকদের অত্যাচারী, দুর্বল, বিশ্বাসঘাতক হিসাবে দেখিয়েছেন। অন্যদিকে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদের ধ্বজা তুলে ধরতে, তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মে হিন্দু দেবীকে অন্তর্ভুক্ত করে, দেশকে 'মা' হিসাবে কল্পনা করেছিলেন। 'বন্দেমাতরম্'-এ দুর্গার স্তব গান গাওয়া হয়েছিল। অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুরাজ্য পত্তনের মাধ্যমে মুসলমানকে ভারতবর্ষীয় সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করার 'অপচেষ্টায়' সামিল হয়েছেন। কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান লেখকদের এই সমস্ত বক্তব্যগুলিকে যেমন সমস্ত মুসলিম শ্রেণি সঠিক বলে মেনে নেননি, তেমনি অন্যান্য আলোচকরাও এই তীব্র বঙ্কিম বিদ্বেষীকে সহ্য করেননি। আর এইভাবেই আমাদের আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যের উদ্‌ঘাটন উঠে আসে।

*স্নাতকোত্তর, ইতিহাস বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail: debasispal2015@gmail.com

দেশীয় রাজ্য কোচবিহারে নারী শিক্ষার পটপরিবর্তন ও ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা (১৮৭০-১৯৩২)

রাহুল দেব*

(প্রাপ্ত ২ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি., মানোনীত ৬ জুলাই ২০১৫ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষের উত্তরপূর্ব সীমান্তবর্তী দুটি দেশীয় রাজ্যের মধ্যে কোচবিহার তার প্রাচীনত্ব ও ঐতিহ্যের দিক থেকে অনেকটাই গৌরব দাবী করতে পারে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নবজাগরণের প্রাক্কালে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে যে ব্রাহ্ম সমাজ সংস্কার আন্দোলন দানা বেঁধেছিল, কিছুটা দেরিতে হলেও তার প্রভাব থেকে কোচবিহারও বাদ যায়নি। উচ্চ প্রশাসনে ব্রাহ্মদের ক্রমাগত আগমন এবং রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করবার দরুন কোচবিহারে যে ব্রাহ্ম সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তা নারী মুক্তি এবং নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে কোচবিহারের দীর্ঘদিনের অচলায়তনকে ভেঙেছিল। এই নিবন্ধে আমার আলোচনার মূল বিষয়বস্তু হল প্রাক্ ব্রাহ্ম সমাজ যুগে কোচবিহারে নারী শিক্ষা বিষয়ে কোচবিহারের দীর্ঘদিনের সামন্তকেন্দ্রিক ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটার এবং নারীশিক্ষাকে রাজপরিবারের ভেতর থেকে বের করে রাজপথের অগুণিত সাধারণ মানুষের মধ্যে সঞ্চারিত করার এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক ধরনের ভিক্টোরিয়ান ভাবাদর্শের প্রচারের ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ।

সূচকশব্দ

আর্যনারী সমাজ, কেশবচন্দ্র, কার্যনির্বাহক সভা, দেশীয় রাজ্য, দেশহিতৈষিনী সভা, নবজাগরণ, নারীমুক্তি, নীতি বিদ্যালয়, ভিক্টোরিয়া কলেজ, নববিধান, রাজবংশ, রাজকর্মচারী, রাজনৈতিক বিবাহ, সুনীতি কলেজ, শিক্ষাদর্শ, স্ত্রীশিক্ষা, টেকনিক্যাল স্কুল, প্রশাসন

*এম.ফিল ছাত্র, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।
e-mail : rdrahuldev06@gmail.com

নদিয়া জেলায় উদ্বাস্তু-জীবন

সুভাষ বিশ্বাস*

(প্রাপ্ত ১২ জুন ২০১৪ খ্রি., মনোনীত ১১ ডিসেম্বর ২০১৪ খ্রি.)

সারসংক্ষেপ

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত একটি বড়ো অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক পাকিস্তানের সৃষ্টি করে। সেই সূত্রে ভারতের বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশও দ্বিখণ্ডিত হয়। পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম পাঞ্জাব পাকিস্তানের এবং পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। দেশভাগের পর থেকে দীর্ঘকাল ধরে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায় উদ্বাস্তু হয়ে সীমান্ত সংলগ্ন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত সর্বাধিক উদ্বাস্তু আশ্রয় গ্রহণ করে পশ্চিমবঙ্গে। উদ্বাস্তু অভিবাসনের বিচারে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলাগুলির মধ্যে নদিয়া জেলা উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে আছে। বর্তমান নদিয়া জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যাই উদ্বাস্তু পরিবারভুক্ত। পূর্ববঙ্গের সাত পুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে নদিয়া জেলায় আসার সময় উদ্বাস্তুদের সীমাহীন দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করতে হয়। সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেও শিয়ালদহ-সহ অন্যান্য রেল স্টেশনে, ফুটপাতে এবং খোলা আকাশের নীচে বিভিন্ন স্থানে আশ্রয় নিয়ে উদ্বাস্তুরা কায়ক্লেশে দিন কাটাতে থাকে। সেখান থেকে নদিয়া জেলার রানাঘাট, ধুবুলিয়া, চাঁদমারি প্রভৃতি উদ্বাস্তু শিবিরে আশ্রয় নিয়েও তাদের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত ছিল না। সরকারি অবহেলায় উদ্বাস্তু শিবিরে তাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। স্থানীয় মানুষজন তাদের অবজ্ঞা করতে থাকে। এভাবেই বেঁচে থাকে নদিয়া জেলার বাঙালি উদ্বাস্তুরা।

সূচকশব্দ

উদ্বাস্তু অভিবাসন, শিয়ালদহ স্টেশন, উদ্বাস্তু শিবির, কুপার্স ক্যাম্প, চাইনিজ মিশন ক্যাম্প, রূপশ্রীপল্লী, ধুবুলিয়া ক্যাম্প, তাহেরপুর, বেনাপোল, পেট্রাপোল, ত্রাণ, পুনর্বাসন

---

*অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, বিদ্যাসাগর সান্ধ্য কলেজ, কলকাতা।
e-mail : subhasbiswaschak@gmail.com

গ্রন্থ সমালোচনা

বাংলা ভাষায় কাশ্মীর নিয়ে একটি ভালো কাজ, তবে আরো বহুমাত্রিক হতে পারত

সুপ্রতিম দাশ*

(প্রাপ্ত ১৭ জুলাই ২০১৫ খ্রি.)

১৯৮০'র দশকের শেষ দিকে শুরু হওয়া কাশ্মীর সংকটের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের কথা অনেক বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন। এগুলি হল: ধারাবাহিকভাবে কাশ্মীরিদের মানবাধিকার লঙ্ঘন; একটি কার্যত হিন্দু রাষ্ট্র থেকে কাশ্মীরি মুসলমানদের বিচ্ছিন্নতাবোধ; এবং ভারত বিভাজনের বহুমাত্রিক অভিঘাত, যার ফলে রাজনৈতিক অস্থিরতা বহু দশক ধরে এই উপমহাদেশের ভবিতব্য হয়ে উঠেছে। প্রায় তিন দশক আগে ১৯৮৮ সালে ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে সেখানকার মুসলমানদের যে গণ-অভ্যুত্থান শুরু হয়েছিল তা আজ দুর্বল হয়ে পড়লেও কাশ্মীরিদের রাজনৈতিক অসন্তোষ ও অবাধ্যতা কিছুমাত্র কমেনি। সঞ্জয় কাক সম্প্রতি দেখিয়েছেন, ২০১০ সাল থেকে কাশ্মীরে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের ধরন-ধারণ চোখে পড়ার মত বদলে গেছে (Sanjay Kak, *Until My Freedom Has come*)। ভারতের সেনা ও আধাসেনাদের দু দশকব্যাপী অভিযান ও অত্যাচারের ফলে কাশ্মীরি জঙ্গিরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। কাশ্মীরের মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে কেবলমাত্র সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে না। আড়াই দশকের ক্ষণিকের আশা এবং নিশ্চিত আশাভঙ্গ, শোকপালন এবং বিক্ষোভে ফেটে পড়া— এ যেন এক অশান্ত রোলার-কোস্টার। মনের আঘাত, শরীরের ক্ষত, মৃত মানুষের সারি—অনেকের মনে প্রশ্ন তুলেছে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে কতকাল অসম লড়াই চালিয়ে যাওয়া সম্ভব? ইতিমধ্যে একটি গোটা প্রজন্ম বেড়ে উঠেছে। তারা কোনো বিকল্প জীবন দেখেনি। তাই তারা

---

* অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, স্কটিস চার্চ কলেজ, কলকাতা।
e-mail: bisk707@gmail.com

সৌম্যেন্দ্রনাথ ও কলিকাতা

(প্রাপ্ত ১৮ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি.)

গৌতম ভদ্র*

ঐতিহাসিক সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি নিবেদিত সম্মাননা প্রবন্ধ সংগ্রহটির নাম ও আলোচ্য বিষয়: *কলিকাতা কলকাতা*। নামটিতেই স্পষ্ট যে শহর কলিকাতা — কলকাতার পর্বক্রম ও রূপান্তর ছুঁয়ে যাওয়াই এই সংগ্রহটির লক্ষ। এই আলোচনা রীতির মাধ্যমে সৌম্যেন্দ্রনাথের ইতিহাসকৃতির প্রতি প্রবীণ ও নবীন বাঙালি ঐতিহাসিকরা শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, কেন না সম্পাদক সৌমিত্র শ্রীমানী একেবারে শুরুতেই জানিয়েছেন 'তিনি আমাদের কাছে বিশেষরকমে পরিচিত কলকাতার ইতিহাস রচনায় নতুন আঙ্গিক সংযোজনের কারণে। সাহিত্যিক উপাদানকে সমাজতত্ত্বের আলোয় জরিপ করার পদ্ধতি তিনি যেভাবে দেখিয়েছেন, তাঁর মূল্য কম নয়।' তাঁর মূল্যায়নেও শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় সৌম্যেন্দ্রনাথের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতিকে মান্যতা দিয়েছেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ও স্বীকার করেছেন নগরের সমাজতত্ত্বের বাইরে প্রাচ্য বিদ্যানুশীলন থেকে ঔপনিবেশিক সমাজে হিতবাদী দর্শনের প্রভাব তথা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আদান-প্রদানের ইতিবৃত্তও সৌম্যেন্দ্রনাথের অন্যতম অনুসন্ধিৎসার বিষয়। এই আদান-প্রদানের ধারাটাকে জোরদার করার জন্য তিনি নিজে নানা অনুবাদকর্মের সম্পাদনা ও সহায়তা করেছেন, যেমন মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাবলীর ইংরেজি ভাষান্তর। আধুনিক বাঙালির প্রাচীন ইতিহাস ও কাব্যচর্চা নিয়েও তাঁর আগ্রহের সাক্ষরও কিছু বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধে দেখি। ঐ ছুটকো আলোচনায় আমার মতো কেউ কেউ আগ্রহী। সংকলনের সম্পাদকও সৌম্যেন্দ্রনাথের বহুধা আগ্রহের কথা উল্লেখ করেছেন। তবে এই সম্মাননার অর্ঘ্যের ডালিতে *কলিকাতা কলকাতা*-ই প্রাগাধিকার পেয়েছে।

ঠিক কলিকাতা বা কলকাতা নয়, সৌম্যেন্দ্রনাথের চর্চার বিষয় কলকাতার শহুরে

* টেগোর ন্যাশানাল ফেলো (অব.), জাতীয় গ্রন্থাগার, কলকাতা।
e-mail: bisk707@gmail.com